ইসলামী ব্যাংকিংঃ-

 ইসলামী শরিয়তের ভিত্তিতে যে ব্যাংক তার কার্যক্রম পরিচালনা করে , তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে । ইসলামী ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামী মুল্যবোধের মাধ্যমে পরিচালিত হয় । মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সুদকে হারাম ঘোষনা করা হয়েছে । এ ব্যাংক সুদ ভিত্তিক লেনদেন থেকে মুক্ত , জমা বা আমানতের উপর কোন সুদ দেয় না এবং ঋনের উপর কোন সুদ গ্রহন করে না

ইসলামী ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্টান যা ইসলামী ব্যাংকিং কারবারে নিয়োজিত , আর ইসলামী ব্যাংকিং কারবাব এমন একটি কারবার যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি ।

ইসলামী ব্যাংক তার লেনদেনের সর্ব ক্ষেত্রে সুদকে বর্জন করে চলে এ ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের মতো ঋনের ব্যবসা করে না এবং সুদের লেনদেন পুরোপুরি বর্জন করে চলে ।

ইসলামী ব্যাংক সুদকে বর্জন করতঃ হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করে । এ ব্যাংক হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগের সাথে সাথে বিনিয়োগের পন্থা ও পদ্ধতিতে ও ইসলামী নীতি মেনে চলে । ইসলামী ব্যাংক কোন হারাম ব্যবসায় বিনিয়োগ করে না ।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যঃ-

ইসলামী ব্যাংক সাধারন প্রচলিত ব্যাংক হতে সস্পুর্ণ ভিন্ন ধরনের । এ ব্যাংকের কতগুলো  বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোন ব্যাংকের নেই । এ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য সমুহ হচ্ছে –

অর্থনৈতিক লেনদেন সুদ বর্জন করাই এ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য । এজন্য এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সস্পর্ণ সুদমুক্ত ।

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়তের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্টিত ও পরিচালিত হচ্ছে ।

ইসলামী ব্যাংক শুধু মুনাফা আয়ের উদ্দেশ্য দ্বারা তাড়িত হয় না , বরং সকল ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের নীতি অবলম্বন করে চলে ।

ইসলামিক ব্যাংক দরিদ্র সম্বলহীন ব্যাক্তিদের সুদ মুক্ত ঋন প্রধান করে ।

ইসলামী ব্যাংক ভবিষ্যতে প্রাপ্য নিদিষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর মুল্য বর্তমানে মক্কেলকে আগাম হিসাবে হস্তান্তর করে ।

ইসলামী ব্যাংক নগদ বিক্রয়ের জন্য নয় , বরং বাকীতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঋনগ্রহীতার পক্ষ্যে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে থকে ।

প্রতি বছর এ ব্যাংক ঘোষিত স্বাভাবিক মুনাফার হার দরিদ্র এবং হিসাব নিকাশ রাখতে অক্ষম ব্যক্তিদের ঋন প্রদান করে ।

ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলিঃ-সুদকে হারাম বলে স্বীকার করে ইসলামী ব্যাংক সকল ধরনের হালাল অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সাহায্য করে এবং সম্পদের সুষম বন্টনে সহায়তা করে । নিন্মে এ ব্যাংকের কার্যাবলি প্রদত্ত হলো -

**১. আমানত গ্রহন**

 অন্যন্য ব্যাংকের মতো ইসলামি ব্যাংক ও জনগনের নিকট হতে অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহন করে । সম্পদকে নিষ্ক্রিয়ভাবে সঞ্চিত করে রেখে আর্থ সামাজিক কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগকে বাধাগ্রস্থ করে রাখা ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না। তাই অলস সঞ্চয়কে সংগ্রহ করে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের পথ সুগম করা ও মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা অবশ্যই অন্যায় কিছু নয়; বরং পুঁজি অলস নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। তাই আমানত সংগ্রহের যে কাজ ব্যাংকগুলো করছে তা দূষণীয় কিছু নয়; বরং এটা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কেননা ব্যাংকের ন্যায় কোন প্রতিষ্ঠান না হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিগুলো সংগ্রহ করে বৃহদায়তন উৎপাদনী কাজে খাটানোর কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া প্রত্যেক পুঁজির মালিকের এমন অভিজ্ঞতাও থাকে না যে, সে তার সঞ্চিত পুঁজিকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করবে। ব্যাংক সেই পুঁজিকে সংগ্রহ করে বৃহদায়তন উৎপাদনে বিনিয়োগ করছে এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তার হাতে এই পুঁজি সরবরাহ করে লাভজনক খাতে বিনিয়োগকে নিশ্চিত করছে; সুতরাং এটি তার একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। কিন্তু যে শর্তে সাধারণ ব্যাংকগুলো এই পুঁজির সমাবেশ ঘটায়, সে শর্তগুলো সুদী প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত বিধায় ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয় ।
ইসলাম বৃহৎপুঁজি সমাবেশের জন্য মুদারাবা পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। যে পদ্ধতিদ্বয়ে পুঁজির ওপর শতকরা হারে সুদ দেয়া হয় না; বরং পুঁজি খাঁটিয়ে যে লাভ হয় সেই লাভ থেকে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে শতকরা হারে লভ্যাংশ দেয়া হয়। ফলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হয় না। আমরা জানি শিরকত হল, অংশীদারী কারবার যেখানে কয়েকজনের পুঁজি যৌথভাবে খাটিয়ে যে লাভ হয় সেই লাভ নিজেদের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে হারাহারিভাবে বণ্টন করে নেয়া হয়।
মুদারাবাহ হল, একজনের মূলধন অন্যজনের শ্রমের সমন্বয়ে ব্যবসা করে যে লাভ হয় পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে শতকরা হারে বণ্টন করে নেয়ার এক বাণিজ্যিক পদ্ধতি।

ব্যাংক সুদবিহীন পন্থায় আমানত সংগ্রহ ও পুঁজির সমাবেশ ঘটানোর জন্য এ দুপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। তবে সেজন্য ব্যাংকের বর্তমান কর্মনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। কেননা বর্তমানে ব্যাংক কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়; বরং ব্যাংক হল, পুঁজির আদান প্রদানকারী মধ্যস্বত্ত্বভোগী এক প্রতিষ্ঠান। শিরকত ও মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য ব্যাংককে বর্তমান অবস্থান থেকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অবস্থানে নেমে আসতে হবে এবং সরাসরি ব্যবসার উদ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

কারেন্ট একাউন্টে যে টাকা রাখা হয় তা মূলত এমন আমানত, যা ব্যবহারের অনুমতি ব্যাংক আমানতকারী থেকে নিয়ে নেয়। যেহেতু এর বিপরীতে কোন রূপ সুদ দেয়া হয় না; তাই ইসলামী পদ্ধতির সাথে এর কোন সংঘাত নেই। ইসলামি পদ্ধতিতেও ব্যাংকে এ ধরনের একটি হিসাব খোলা যেতে পারে, যেখানে আমানতকারীরা টাকা জমা রাখবে এবং যখন ইচ্ছা তখন তা উঠিয়ে নিতে পারবে।

**২. বিনিয়োগ**

ব্যাংকে যদি মুদারাবার ভিত্তিতে টাকা আমানত রাখা হয়, তাহলে যারা টাকা জমা দেবেন তারা হবেন রাব্বুল মাল বা পুঁজির মালিক, আর ব্যাংক হবে মুদারিব বা কারবারী। ফিকাহশাস্ত্রের স্বীকৃত বিধান এই যে, রাব্বুল মাল যদি মুদারিবকে টাকা বা পুঁজি অন্য কোন কারবারীর কাছে মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার অনুমতি প্রদান করে, তাহলে মুদারিব অন্য কারবারীর কাছে টাকা মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

এই স্বীকৃত বিধানের আলোকে ব্যাংক যদি সঞ্চিত মূলধন অন্য ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তার কাছে মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে, তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে ব্যাংকের এ ধরনের বিনিয়োগে লাভ করতে হলে, রাব্বুল মালের সাথে যে হারে লভ্যাংশ দেয়ার শর্ত থাকবে তার চেয়ে বর্ধিত হারে লাভ প্রদানের শর্তে টাকা বিনিয়োগ করতে হবে।

ইসলামে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার যেসব পদ্ধতি রয়েছে ব্যাংক তার সবগুলো পন্থায়ই পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে। যেমন :

১. সাধারণ ব্যবসায় বিনিয়োগ : অর্থাৎ ব্যাংক সরাসরি নিজে ব্যবসা বাণিজ্য করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।
২. শরিকানা ব্যবসায় বিনিয়োগ : অর্থাৎ অন্যের সাথে শরিকানার ভিত্তিতে ব্যবসা করতে পারে।
৩. মুদারাবায় বিনিয়োগ : অর্থাৎ আমানতকারীদের অনুমতিক্রমে অন্য কোন ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাদের কাছে মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারে।
৪. বাই-মুরাবাহায় বিনিয়োগ : অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করে ক্রয়মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট লাভ সংযোজন করে বিক্রি করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করতে পারে।
৫. বাই-মুআজ্জলে বিনিয়োগ : অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করে বাকিতে (অধিক মুনাফায়) বিক্রি করে লাভ করতে পারে।
৬. বাই সালামে বিনিয়োগ : অর্থ‍াৎ টাকা নগদ পরিশোধ করে পণ্য বাকিতে (স্বল্পমূল্যে) ক্রয় করে (পরে বিক্রি করে) লাভ কামাতে পারে।
৭. সাধারণ ভাড়ায় বিনিয়োগ : অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করে ভাড়ায় দিয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে।
৮. বিক্রয়ের জন্য ভাড়া দান প্রকল্পে বিনিয়োগ : অর্থাৎ পণ্য ভাড়ায় দিয়ে ক্রমান্বয়ে কিস্তিতে বিক্রয় করে লাভ করতে পারে।
এছাড়াও ব্যাংকের অর্থ উপার্জনের অনেক পন্থা রয়েছে। যেমন, কোন প্রজেক্টে আংশিক কাজ করার পর অন্যের কাছে লাভে বিক্রয় করা, কমিশনের ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহ করা, সেবা কর্মের বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ করা, সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা ইত্যাদি বৈধ পন্থায় ব্যাংক অর্থ উপার্জন করতে পারে।

ব্যাংক যখন মূলধন সরাসরি ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, তখন বৈধ পন্থায় বৈধ পণ্যের ব্যবসা করে যে মুনাফা অর্জন করবে তা হালাল হওয়ার বিষয়টি প্রশ্নাতীত। কিন্তু যখন সে অন্যের সাথে শরিকানা ব্যবসায় নিয়োজিত হবে কিংবা মুদারাবার শর্ত-শারায়েত মেনে লেনদেন করতে হবে।

মুদারাবা ও শরিকানা ব্যবসায় বর্তমানে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন:

১. বিশ্বস্ততার অভাবজনিত সমস্যা
২. ইনকাম ট্যাক্সের সমস্যা
আজকাল যাকেই মুদারাবা বা শিরকতের ভিত্তিতে টাকা দেয়া হবে, সে কখনই প্রকৃত লাভ দেখাবে না; বরং খাতাপত্রে লোকসান দেখিয়ে দেবে। এমতাবস্থায় এ পন্থায় লাভজনক ব্যবসাতো দূরের কথা আসল পুঁজি ফিরে পাওয়াও দুষ্কর হবে। এ সমস্যা কি করে নিরসন করা যাবে? আমরা মনে করি মানুষের মাঝে সততা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং আধুনিক ব্যাংকগুলো তাদের ক্ষেত্রে যে একাউন্টিং প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এ ক্ষেত্রেও তাই প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানকে এই শর্তের ভিত্তিতে টাকা প্রদান করা হবে যে, তার কোষাধ্যক্ষ ব্যাংক সরবরাহ করবে। যে কোম্পানি একবার এরূপ খেয়ানত করেছে বলে জানা যাবে তাকে ব্লাক লিস্টেড করে রাখা হবে। ভবিষ্যতে তাকে কোন ধরনের ঋণ সহায়তা দেয়া হবে না। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এবং আইনকে দ্রুত কার্যকর করার ব্যবস্থা থাকলে এ সমস্যা নিরসনের পথ বেরিয়ে আসবে।
আর প্রকৃত মুনাফা কত হয়েছে তা দেখানো হলে ইনকাম ট্যাক্সের যে বাড়তি চাপ শুরু হবে সে ঝামেলা এড়ানোর জন্য সরকারকে ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তন আনতে হবে।

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোন কোম্পানির সম্পূর্ণ অংশে শরিক হওয়া অপরিহার্য নয়। কোন এক বিশেষ অংশেও শরিক হওয়া যায়। পূর্ব থেকে চলে আসছে এমন কোন ব্যবসাতেও পুঁজি বিনিয়োগ করে তার অংশ বিশেষে শরিক হওয়া যায়। আবার নির্ধারিত মেয়াদের জন্যও অংশীদার হওয়া যায়। এ জন্য উভয় পক্ষের মাঝে এ ধরনের চুক্তি হতে পারে যে, এই নির্ধারিত সময়ের ভেতর ব্যবসা পরিচালনা করতে যা ব্যয় হবে শুধু তাই হিসাব করে যে গ্রাস মুনাফা দাঁড়াবে, তা উভয় পক্ষের মাঝে বণ্টিত হবে। যেহেতু স্থায়ী মূলধনগুলো এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর বিনিয়োগকৃত তাই তাকে লাভের হার বেশি দেয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে সরল হিসাবে ব্যবসা হতে পারে। এতে ধোঁকা বা প্রতারণার সম্ভাবনাও কম থাকে।

**৩. ইজারা বা ভাড়া প্রদান**

মূলধন বিনিয়োগ করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে শিরকাত ও মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে ইজারা বা ভাড়ার প্রক্রিয়ায় মূলধন বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা যায়। বিনিয়োগের জন্য ভাড়ার পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে শরিয়তে ভাড়া দানের যে বিধিবিধান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। আজকাল লীজের নামে যে পদ্ধতিগুলো প্রচলিত রয়েছে তাতে ইজারা বা ভাড়ার বাস্তবতা বিদ্যমান থাকে না।

কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন দ্রব্য ভাড়া দেয়ার জন্য যিনি ভাড়া দেবেন দ্রব্যটি তার মালিকানাভুক্ত ও দখলভুক্ত থাকতে হবে। আর যে সময় পর্যন্ত দ্রব্যটি ভাড়ায় খাটবে সেই সময় পর্যন্ত এর দায়ভার মালিক বহন করবে অর্থাৎ ভাড়াটিয়ার কোন রূপ অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ ছাড়া যদি স্বাভাবিক কারণে কাজ করতে যেয়ে বা অন্য কোনভাবে এটি নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা মালিকের ক্ষতি বলে গণ্য হবে এবং দ্রব্যটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়ার চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে।
কিন্তু আজকাল সাধারণত যা হয় তাতে ভাড়াদাতা ভাড়ায় দেয়া দ্রব্যটির কোন দায়দায়িত্ব বহন করেন না। যদি ভাড়ায় দেয়া দ্রব্যটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তো ভাড়াটিয়ার ক্ষতি বলে গণ্য হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, ভাড়ায় দেয়া দ্রব্যটি কবেই নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেছে অথচ ভাড়াটিয়া ভাড়া দিয়েই যাচ্ছেন। সুতরাং বাস্তবে ইজারার যেসব শর্ত শরিয়েত রয়েছে, তা আধুনিক লীজে পাওয়া যায় না। এ কারণেই শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলো বৈধ হবে না।

তবে ইজারার ক্ষেত্রে শরিয়ত যেসব শর্ত শরায়েত আরোপ করেছে, সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি ব্যাংক ইজারায় বিনিয়োগ করে, তাহলে তা বৈধ হবে।

**ইজারার মাঝ দিয়ে বিক্রয়**

ইজারার মাঝ দিয়ে বিক্রয়ের একটি প্রথা বর্তমানে চালু হয়েছে। এটি দুইভাবে করা হয়। যথা :
১. এই শর্তে ভাড়া নেয়া যে, ভাড়া পরিশোধ করতে করতে যখন এই পরিমাণ টাকা পরিশোধ হয়ে যাবে যা ভাড়ায় দেয়া দ্রব্যটির মূল্য ও কাঙিক্ষত পরিমাণ লাভের সমপরিমাণ হয়ে যাবে, তখন দ্রব্যটি ভাড়াটিয়াকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি এটি ভাড়ার শর্ত থাকে, তাহলে এটি বৈধ হবে না। ) কেননা এটি তখন এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তি অনুপ্রবিষ্ট করা এর পর্যায়ে পড়ে যাবে; যা বৈধ নয়। (তবে শর্ত না করে যদি ব্যাংক ঐ পরিমাণ টাকা আদায় হয়ে যাওয়ার পর ভাড়াটিয়াকে দ্রব্যটি দিয়ে দেয়, তাহলে উপঢৌকন হিসেবে তা বৈধ হয়ে যাবে।
২. অনেক সময় ইজারার চুক্তির পর ভাড়া দেয়া দ্রব্যটি কিস্তিতে বিক্রয়ের জন্য মালিক পক্ষের সাথে ভাড়াটিয়ার এ মর্মে চুক্তি হয় যে, ভাড়া পরিশোধের সাথে সাথে দ্রব্যটির মূল্য বাবত প্রতি মাসে বা প্রতি তিন মাসে এত টাকা করে পরিশোধ করা হবে। এভাবে যখন দ্রব্যটির মূল্য পরিশোধ হয়ে যাবে, তখন দ্রব্যটি ভাড়াটিয়ার হয়ে যাবে। যদি পৃথক পৃথক দুটি চুক্তির মাধ্যমে এটি করা হয়, তাহলে তা বৈধ হয়ে যাবে। তবে একই চুক্তিতে এমনটি করা হলে তা বৈধ হবে না। কেননা তখন সেটা ‘শর্তের ভেতর আরেক শর্ত’ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

**৪. মুরাবাহা**

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন কোন একটি দ্রব্য ক্রয় করার জন্য ব্যাংকের কাছে ঋণ নিতে আসে, তখন এ ধরনের ব্যক্তিদের সাথে ব্যাংক এ মর্মে চুক্তি করতে পারে যে, আমরা এই দ্রব্যটি ক্রয় করে শতকরা ১০% লাভে আপনাকে সরবরাহ করব। উভয়পক্ষ সম্মত হলে বৃহৎমানের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক এ ধরনের মুরাবাহার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। মুরাবাহা নগদ ও বাকি দু’ ভাবেই হতে পারে। নগদ মূল্য পরিশোধ করলে ক্রয়মূল্যের ওপর শতকরা যত টাকা লাভ ধার্য করা হবে, ৬ মাস বা এক বছর পরে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে লেনদেন করা হলে ক্রয় মূল্যের ওপর সংযোজিত লাভের হার অবশ্যই বেশি ধার্য করা যাবে।

বর্তমানে এই পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংকগুলো ব্যাপক হারে অর্থ বিনিয়োগ করছে। স্মরণযোগ্য যে, মুরাবাহার শর্তসমূহ পূর্ণভাবে অনুসরণ না করা হলে এটি সামান্য কারণেই সুদে পরিণত হতে পারে। বর্তমানে মুরাবাহার লেনদেনে যেসব ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. বর্তমানে যে বস্তু পূর্ব থেকেই ক্লায়েন্টের নিকট থাকে তার ওপরই মুরাবাহার চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ব্যাংক উক্ত ব্যক্তি থেকে নগদ কম মূল্যে বস্তুটি ক্রয় করে নেয় এবং তার উপর লভ্যাংশ সংযোজন করে বাকিতে আবার তারই নিকট বিক্রি করে দেয়। বাস্তবে এটা মুরাবাহা হয় না; বরং এর সাথে বর্ধিত মুনাফা সংযোজন করে দেয়া হয়। এটি শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা কোন পণ্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করার পর আবার তারই নিকট অধিক মূল্যে বিক্রি করা বৈধ হয় না। কারণ এটি সুদী ঋণেরই সাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা যদি দ্রব্যটি ১০০ টাকা দিয়ে ক্রয় করে ১২০ টাকায় বিক্রি করা হয়, তাহলে ১০০ টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে ১২০ টাকা নেয়ার মতই মনে হয়। বিশেষ করে যখন ক্রয় করার সময় তার কাছেই পুনরায় বিক্রয় করার শর্ত লাগানো হবে তখনতো তা  বিক্রয়ের সঙ্গে শর্ত জুড়ে দেয়ার কারণে অবৈধ হয়ে যাবে।
২. অনেক সময় (ইুঁ ইড়ধপশ)-এর লেনদেন শুধু কাগজী চুক্তি হয়। বাস্তবে ঐ দ্রব্য ক্লায়েন্টের কাছেও থাকে না। শুধু কাগজপত্রে চুক্তি করে ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে কর্মচারী ইত্যাদির বিল পরিশোধ করা হয়। এটিও বৈধ হবে না।
৩. অনেক সময় বাস্তবে মুরাবাহার চুক্তি হলেও ক্রয়কৃত দ্রব্য ব্যাংক কব্জা না করেই ক্লায়েন্টকে কম্পানি থেকে সরাসরি সরবরাহ করে। অথচ মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য উক্ত পণ্য দ্রব্য ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। আর সে জন্যই তা ব্যাংকের কব্জায় আসা জরুরি। কিন্তু ব্যাংক তা কব্জা না করেই গ্রাহককে সরবরাহ করে থাকে। এইসব চাতুরী না করে মুরাবাহার পদ্ধতি ও তার শর্ত শরায়েত যথার্থভাবে অনুসরণ করে লেনদেন করা হলে তবে এ পন্থায় বিনিয়োগ বৈধ হবে।
৪. আজকাল অনেক ব্যাংক মুরাবাহায় বিনিয়োগ করতে গিয়ে গ্রাহককে প্রদেয় দ্রব্যটির মূল্য যা হয় সেই পরিমাণ অংক মুরাবাহার জন্য বরাদ্ধ করার পর ব্যাংক নিজে ক্রয় করার ঝামেলা না উঠিয়ে খোদ গ্রাহককেই দ্রব্যটি ক্রয় করার জন্য উকিল নিয়োগ করে থাকে।
গ্রাহক ব্যাংকের নিয়োজিত প্রতিনিধি হিসেবে দ্রব্যটি ক্রয় করার পর ব্যাংককে তা বুঝিয়ে দেয়ার পর গ্রাহক হিসেবে নতুন করে  ব্যাংকের  সাথে ইজাব-কবুল (প্রস্তাব ও সম্মতি)-এর মাধ্যমে দ্রব্যটির মালিকানা তার বুঝে নেয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না করে গ্রাহক দ্রব্যটি ক্রয় করার পর ব্যাংককে বুঝিয়ে না দিয়েই সরাসরি সেটি নিজের ব্যবহারে নিয়ে নেয়। ফলে এ ক্ষেত্রে বাস্তবে মুরাবাহার চুক্তি আইনানুগভাবে সংঘটিত হয় না। কেননা দ্রব্যটি ক্রয় করার পর ব্যাংককে মালিকানা বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় মুরাবাহার প্রস্তাব ও গ্রহণের মাধ্যমে তা গ্রহণ করা না হলে এটি কোন চুক্তি হবে না এবং এ পদ্ধতিতে গৃহীত দ্রব্য ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হবে।
৫. আজকাল অনেক ইসলামি ব্যাংক গ্রাহকের সাথে মুরাবাহার চুক্তি করার সিদ্ধান্ত করার পর কত টাকা এ খাতে বরাদ্ধ করা হবে এই সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত করে। এরপর গ্রাহকের বরাবরে ঐ পাওনা টাকার বিল পেশ করে তাতে তার এন্ডোসমেন্ট নিয়ে নেয়। ফলে সেটি বিল অফ এক্সচেঞ্জে পরিণত হয়। কিংবা প্রমিসরী নোটে তার স্বাক্ষর নিয়ে নেয়া হয়। অথচ দ্রব্যটি তখনও ক্রয় করাই হয়নি এবং গ্রাহককে তা সরবরাহও করা হয়নি। এ ধরনের অগ্রিম স্বাক্ষর গ্রহণ করাও বৈধ হবে না। কেননা যখন তার কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের স্বীকারোক্তিমূলক স্বাক্ষর নেয়া হচ্ছে, তখন সে ব্যাংকের কাছে ঋণীই হয়নি। সে ঋণী সাব্যস্থ হবে তখন যখন ব্যাংক দ্রব্যটি ক্রয় করে মুরাবাহার প্রস্তাব ও গ্রহণের মাধ্যমে সেটি তাকে হস্তান্তর করা হবে। যদি বিলে কিংবা প্রমিসরী নোটে স্বাক্ষর নিতে হয়, তাহলে দ্রব্যটি তাকে সরবরাহ করার পর নিতে হবে।
৬. যথাসময়ে ঋণ আদায় না করলে সুদী ব্যাংকসমূহ সুদকে আসলের সাথে মিলিয়ে তার ওপর পরবর্তী মেয়াদের সুদ হিসাব করে থাকে। এটাকে পরিভাষায় রোল অভার (জড়ষষ ঙাবৎ) বলা হয়। এভাবে যতদিন সে ঋণ আদায় না করে চক্র বৃদ্ধিহারে সুদ বাড়তে থাকে। আজকাল অনেক ইসলামি ব্যাংক বাকিতে মুরাবাহা করতে গিয়ে যত দিনের জন্য বাকি দেয়া হয় সেই হিসাবে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন করে। কিন্তু যদি এই মেয়াদের মাঝে গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে (জড়ষষ ড়াবৎ) এর ন্যায় পুন:মূল্য ধার্য করে। অর্থাৎ যদি ১০০ টাকার দ্রব্য ৬ মাসের বাকিতে ১১০ টাকায় মুরাবাহা করা হয়ে থাকে, আর গ্রাহক ৬ মাসের মাঝে তা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে সেই চুক্তিকে নবায়ন করে এক বছরের জন্য ১২০ টাকায় পুন:মুরাবাহা করা হয়। এটিও বৈধ হবে না। কেননা একটি দ্রব্যের মূল্য একবার নির্ধারণ করার পর সেই ক্রেতা বিক্রেতার জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পুন:মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তাই এই নির্ধারিত মূল্য কমানো বাড়ানো বৈধ হবে না। তাছাড়া একবার বর্ধিত মূল্য সংযোজন করার পর পুনরায় মূল্য সংযোজন করাও সঙ্গত হবে না। বস্তুত মুরাবাহার শর্ত শরায়েতের প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে এ ধরনের জটিলতটাসমূহ সৃষ্টি হয় এবং লেনদেন শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়ে যায়।
৭. বাকিতে যখন মুরাবাহা করা হয় তখন গ্রাহক ব্যাংকের কাছে ঋণী হয়ে যায়। এই ঋণ আদায়ের গ্যারান্টি হিসেবে ব্যাংক বন্ধকীর দাবি করতে পারে। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে যে পণ্যটি মুরাবাহায় বিক্রি করা হয় সেটিকেই বন্ধকী হিসেবে রেখে দেয়া হয়। এ পদ্ধতিটি বৈধ নয়। কেননা মূল্য পরিশোধ করার জন্য পণ্য আটকিয়ে রাখার অধিকার বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার নেই। তবে বন্ধকী হিসেবে দ্রব্যটি বিক্রেতা নিজের কাছে রাখতে পারে। কিন্তু তার জন্য শর্ত এই যে, প্রথমে দ্রব্যটি ক্রেতাকে বিক্রেতার কাছ থেকে হস্তগত করতে হবে। অতঃপর বন্ধকী হিসেবে ক্রেতা নতুন করে বিক্রেতার কাছে তা সমর্পণ করবে।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন হতে পারে যে, ক্রেতা কর্তৃক দ্রব্যটি হস্তগত করার পর পুনরায় বন্ধকী হিসেবে বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা, আর দ্রব্যটি বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় একথা বলা যে, এটি বন্ধকী হিসেবে আপনার হাতে থাক এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য কোথায়?

ফিকাহশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কেননা ক্রেতা দ্রব্যটি হস্তগত করার পূর্বপর্যন্ত এটি এমন বিক্রিত পণ্য হিসেবে গণ্য হবে যা বিক্রেতাকে সরবরাহ করা হয়নি। বিক্রিত পণ্য ক্রেতাকে সরবরাহ করার পূর্বে যদি বিক্রেতার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ক্রেতা উক্ত পণ্যের বাজারদর হিসাবে যা মূল্য দাঁড়ায় সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবে এবং দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যখন ক্রেতা হস্তগত করার পর বন্ধকী হিসেবে বিক্রেতাকে তা সমর্পণ করবে তখন বিক্রেতার হাতে এটি বন্ধকী হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এমতাবস্থায় যদি দ্রব্যটি স্বাভাবিক কারণে বিনষ্ট হয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু যদি বিক্রেতার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের কারণে দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। বাজারদর হিসাবে যা মূল্য হয় সে পরিমাণ পরিশোধ করলে চলবে না। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়ে গেলেও ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিটি বাতিল হবে না।

আজকাল সিম্পল মর্টগেজ নামে নতুন এক ধরনের বন্ধকী প্রথার প্রচলন হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যে বস্তু বন্ধক দেয়া হয় তা বন্ধকদাতার হাতেই থাকে এবং সে তা ব্যবহারও করতে পারে। তবে সে তা বিক্রি করতে বা অন্যকে ব্যবহার করতে দিতে পারে না। কিন্তু আইনানুগভাবে বন্ধক গ্রহীতার এই অধিকার থাকে যে, যথাসময়ে ঋণের টাকা আদায় না করলে সে তা বিক্রি করে ঋণের টাকা উসূল করে নিতে পারে।

সাধারণ নিয়মানুসারে বন্ধক হিসেবে প্রদত্ত বস্তু বন্ধকগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করে দিতে হয়। তা না হলে বন্ধকীর চুক্তি শুদ্ধ হয় না। তবে বৃহৎ মেশিনারী স্থানান্তর অসুবিধার হওয়ায় এটি রাখার জন্য স্থানের প্রয়োজন হয় বিধায় বন্ধকগ্রহীতা যদি তা বন্ধকদাতার নিকট রাখতে চায়, তাহলে তা রাখতে পারবে। তবে বন্ধক গ্রহীতা সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে মেশিনটি যদি দেখে আসে এবং তার গায়ে অমুকের কাছে দায়বদ্ধ এরূপ কোন লেবেল লাগিয়ে রেখে আসে তাহলে এটি তার হস্তগত করার শামিল হবে।

অনেক সময় ঋণ আদায়ের গ্যারাটি হিসেবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে জামিন দেয়া হয়। শরিয়তের পরিভাষায় একে কাফালাহ বলা হয়। এটি শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে। তবে যিনি কফীল বা জামিন হবেন তিনি এ বাবত কোন ফি গ্রহণ করতে পারবেন না; করলে শরয়ী বিধানানুসারে তা না জায়েয হবে।

**৫. বাই-সলম (বা অগ্রিম ক্রয়)**
যে বেচাকেনায় মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা হয় দ্রব্য বাকি থাকে তাকে বাই-সলম বলে। বাই-সলম শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ এবং এই টাকার বিনিময়ে পরিশোধিতব্য দ্রব্য, ঐ দ্রব্যের পরিমাণ, গুণগত মান, কোন মাসের কত তারিখে কোন স্থানে দ্রব্য বুঝিয়ে দেয়া হবে এসব বিষয় পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হয়। কৃষকরা চাষাবাদ করার জন্য পুঁজির সংকটে পড়লে ধনিক শ্রেণীর কাছে কৃষিজাত পণ্য এ ধরনের অগ্রিম বিক্রি করে দিত। ধনীরা এ ধরনের অগ্রিম ক্রয়ের দ্বারা দামের দিক থেকে যথেষ্ট রেয়ায়েত পেতেন।

এই ফর্মূলাটি শিল্পজাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে উদ্যোক্তারা পুঁজি সংকটের মুকাবিলা করতে পারেন এবং ব্যাংকগুলো এ ধরনের শর্তে শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত পণ্য অগ্রিম ক্রয় করে শিল্পোদ্যোক্তারাদের কাছে পূঁজি বিনিয়োগ করতে পারে।
যেমন কোন কাপড় কম্পানিকে ১০ হাজার টাকা পুঁজি এই শর্তে দেয়া হল যে, আগামী জানুয়ারিতে এক হাজার একক কাপড় ঢাকার লালবাগ ফ্যাক্টরি থেকে সরবরাহ করা হবে। যেহেতু অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হবে সেহেতু ব্যাংক দামে রেয়ায়েত পাবে। এই পণ্য বাজারদরে বিক্রি করে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে ব্যাংক যদি ক্রয়কৃত সাবান বিক্রি করার ঝামেলায় না যেতে চায় তাহলে ঐ কম্পানিকেই কাপড়গুলো বিক্রি করে দেয়ার জন্য স্বল্প কমিশনে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করতে পারে।

৬. কর্জে হাসানা- লাভমুক্ত ঋণঃ- এ পদ্দতি শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় স্বনির্ভতা অর্জনের লক্ষ্যে অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে , এজন্য ঋণ গ্রহীতা কোন ধরনের জামানত দেয় না , ব্যাংক ও কোন ধরনের সার্ভিস চার্জ আদায় করে না ।

৭ . যাকাত ফান্ডঃ – ইসলামী ব্যাংক তার নিজের প্রদত্ত যাকাত ও মক্কেলদের প্রদত্ত যাকাত দিয়ে একটি যাকাত ফান্ড গঠন করে । এ ফান্ডের যাবতীয় অর্থ সমাজের গ্রিবো দুঃস্থ লোকদের কল্যানে ব্যয় হয় ।

সাধারন ব্যাংক সমুহ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সকল কর্ম প্রচেষ্টা ব্যয় করে । জন সাধারনের কল্যানের লক্ষ্যে তারা সচেষ্ট নয় । কিন্তু ইসলামী ব্যাংক মুনাফা অর্জনে অগ্রহী নয় ।সমাজের দুঃস্থ ও গরিব জনোগোষ্ঠীর কল্যানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্ষেত্র তৈরি করে ।